

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৮)

শীতের বিকেলটা কেমন টুপ করে রাত ডেকে আনে। বিকেলের রোদ গায়ে লাগার সাথে সাথেই যেনো কোথায় উবে যায়। চারপাশ কুঁয়াশার চাদরে ঢেকে নেমে আসে সন্ধ্যা। আমাদের গ্রাম থেকে হাই-স্কুল প্রায় চার মাইল তো হবেই। বিকেল চারটায় স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমে আসে। এই মাইল চারেক পথ বিকেলের রোদে হেঁটে আসি আমরা অনেক বন্ধুরা। একেক পথের বাঁক পাড় হই তো দল ছুট হয়ে যায় অনেকেই। আমরা যারা একেবারে শেষের যাত্রী তারাই এগিয়ে যাই মাঠের পর গ্রাম পেরিয়ে। তার পর এক সময় শেষের গ্রামের বাঁশ-ভিটে পাড় হলেই উঁকি দেয় আমাদের গ্রাম। ঠিক একটা সরল রেখায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় মাইল খানেক দৈর্ঘ্যের গ্রাম খানি। একটি বিরাট আয়তনের থালার মধ্যে খান বরাবর একটি রেখার মতোই এর অবস্থান। চারদিকেই নীচু জমির মাঠ। তাই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িই অনেক উঁচুতে তৈরি করা বর্ষার প্লাবন থেকে রক্ষা করতে। মাঠ থেকে বাড়িতে উঠতে যেনো বদ্যিনাথ মন্দিরের অনেক অনেক সিঁড়ি মাড়িয়ে উঠতে হয়।

প্রত্যেক বাড়ির সামনেই আয়তকারের জলাশয়। আমরা বলতাম “মাইটেল”। হয়তো এটেল মাটি থেকেই শব্দটি আসতে পারে? পুকুরের জল থেকে কুঁয়াশার বাষ্প কেমন অন্ধকার করে দিতো দৃষ্টি-পথকে। তার উপর সকালের সূর্যের আলো পড়ে কেমন এক রংয়ের রেখা তৈরি করতো। যেনো হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চিক চিক করতো চারপাশ। এই মাইটেলে জল থাকে প্রায় সারা বছরই। আর থাকে কচুরি পানা। এই কচুরি পানার নীচে ডুবানো থাকে নৌকা - যা সারা বর্ষায় কাজে আসে। আর এই ডুবানো নৌকায় ঝাটা গুজে মাছ থাকার ব্যবস্থা করে রাখে সবাই। দু’এক সপ্তাহ পর পর এই নৌকা সেচে ধরা হয় বিভিন্ন রকমের মাছ। আমাদেরও ছিল তেমনি কয়েকটা ডুবানো নৌকা। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাই একেকটা নৌকা সেচে মাছের ব্যবস্থা হয়ে যেতো। জলাশয়ের এক পাশে বাড়ির ঘাট তৈরি করা হতো কচুরি পানা সাফ করে। কয়েক টি বাঁশের ফালি আড়া আড়ি পেতে শক্ত খুঁটির উপর তৈরি এই ঘাট জলাশয়ের ভেতর অনেক দূর এগুনো থাকতো। আমরা অনেকেই এক সংগে বসে স্নান সেরে নিতাম ঘটি কিংবা কাঁসার কোন পাত্র দিয়ে। শীতের দিনে পুকুরের জল ভীষণ ঠান্ডা। ঠান্ডা জলে স্নান করা এক মহাঝামেলা। বাড়ির বড়রা বলতো স্কুলে যাবার আগে স্নান করতে। কেননা, শীতের সকালে পুকুরের জল থেকে বের হয় কুঁয়াশার বাষ্প। আর কচুরি পানা সংলগ্ন জলও নাকি খুব গরম। আমি ভীষণ ঘুম কাতুরে। এখন ও যেমনটি ঠিক যখন না উঠলেই নয় তখনি উঠি। ছোট বেলাতেও সকালের পড়ার জন্য অনেক ঠ্যালা-ঠেলির পর যখন না উঠলেই চলে না তখনি উঠতাম। তাই ভোরের সেই বাষ্প-উঠানো পুকুরের জলে স্নান করার সৌভাগ্য আমার কখনোই হয়ে উঠে নি।

কিন্তু গ্রামের অনেক মহিলাদেরই দেখতাম প্রায় সকালেই স্নান সেরে নিতে । পরে বড় হয়ে জেনেছি, প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ঋতুস্রাবের সময় আর সংগমের পর খুব সকালে সূর্য উঠার আগেই স্নান সেরে পরিস্কার হতে হতো রমনীদের। এটাই নিয়ম প্রায় সব পরিবারেই । শিক্ষিত - অশিক্ষিত কাউকেই এর ব্যত্যয় করতে দেখি নি । তাই প্রায় সকালেই কাউকে না কাউকে স্নান করতে দেখাই যেতো । আর অনেক পুরুষদেরকেও দেখেছি বিশেষতঃ যারা বিশেষ গুরুত্ব কাছে দীক্ষায় দীক্ষিত - তারাও স্ত্রী সংগমের পর সকালে স্নান সেরে নিতো । আমাদের এক সিনিয়র বন্ধু যে কোন কারণেই হোক সকালে স্নান করতো । আমরা বলতাম , প্রায় প্রতি রাতেই স্বপ্ন-দোষে বীর্যস্থলন হয় ব'লেই ও স্নান করে । আমার এক সব-জা ভ্রাতা বন্ধু ওকে বারণ করে দিতো হস্তমৈথুনে কিংবা আবোল তাবোল ভাবতে-যাতে স্বপ্নে বীর্যস্থলন না হয় । কারণ, ওর ভাষায় ষাট ফোঁটা দুধে এক ফোঁটা রক্ত আর সেই ষাট ফোঁটা রক্ত থেকেই এক ফোঁটা বীর্য তৈরি হয় । এখনো গ্রাম কেন, শহরের ছেলে মেয়েদেরও প্রজনন জ্ঞান তেমনি আছে বলেই জানি । আর খুব কম বাবা -মায়েরাই আছেন সন্তানদেরকে জীবনের একটি বিশেষ সময়ের এই শারীরিক প্রক্রিয়াকে সহজভাবে নিতে সহায়তা করে থাকেন । সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন ফারাক নেই । ছেলে-মেয়েরা তাই নানাবিধ কুসংস্কার কিংবা ভুল ধারণা থেকেই জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে হাবুডুবু খায় সেই বয়ঃসন্ধিকালের সময়টাতে। আজ অনেক দিন প্রবাস জীবনে থেকেও প্রাচ্য আর প্রাশ্চাত্যের মধ্যে খুব একটা তফাৎ দেখি কী ? যদিও এখন প্রজনন শিক্ষা অনেক স্কুলেই পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

আমাদের বাড়িতে দেখেছি অনেক দিনের পুরানো একটি নলকূপ । কত পুরানো কালে সেটা পোঁতা হয়েছে আমরা জানি না । তবে শুনেছি সেটা নাকি ব্রিটিশ শাসনের সময় বসানো । কিন্তুবাড়ির মানুষের সেই নলকূপের প্রতি এক ধরনের মমত্ব বোধ লক্ষ্য করেছি । কারণ, গ্রামে গ্রামে যখন কলেরায় মানুষ মরে গেছে বেসুয়ার , আমাদের পরিবারের কাউকেই কলেরায় পায় নি । বড়দের ধারণা , এই নলকূপটির জন্যই রক্ষা পেয়েছে পরিবার । জানিনা, কেমন করে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটা বাস্তব সম্মত ধারণাতে পরিনত হয়েছে । পানীয় জল নিয়ন্ত্রন করলেই যে অনেক রোগ ব্যাধি থেকে দূরে থাকা যায় -এটা তো উন্নয়নশীল দেশগুলোরও এখন একটা শ্লোগান ।

আর এ সবার পেছনে যার অবদান সে আমার পিতামহী । আমরা যখন বুঝতে শিখেছি সে সময়েই তাকে দেখেছি বয়সের ভারে জুবুজুবু এক বয়বৃদ্ধা । অথচ , আর সবার থেকে খানিকটা আলাদা । আলাদা সব থেকেই। কখনো পূজা -পার্বণ , সন্ধ্যা -আরতি , এমনকি ঈশ্বরের নাম নিতেও দেখি নি । আর এ বিষয়ে কোন আলোচনাতেও তাকে কেউ দেখেনি । সারা দিন এটা সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন । আর সন্ধ্যা হলেই পান ছঁ্যাচার খট খটানি - এক নিয়মিত তালে বেজে চলা শব্দ । যখন শব্দ থামতো সবাই বুঝতাম ঘুমিয়েছেন আমাদের ঠাকুর-মা । নির্লিপ্ত- নির্বিকার প্রায় সব ব্যাপারেই । বিরাট পরিবারের কত্রী । সাত ছেলে -বৌয়ের শ্বাশুড়ি । অথচ কোন বৌয়ের সাথেই তার কোন বিবাদ বিসম্বাদ নেই । পরিবারের কোন ব্যাপারেই নেই কোন আগ্রহ । পরে একেকবার মনে হয়েছে নিষ্কাম কর্মের যে পথের কথা বলা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়, তার মর্মবানীই কেমন করে যেনো আত্মস্থ করে ফেলেছেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে স্বশিক্ষিতা এই মহিলা । তাই তো সংস্কার-সংস্কৃতিতে তার সময়ের চেয়েও অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন তিনি । এমনকি আজকের যুগের অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষদের চেয়েও । তাই তো , পরিবারের বিভিন্ন আচরনে তার

বুদ্ধিমত্তার প্রতিফলন পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে অনেক বিপদ থেকে ।

আর সব যৌথ পরিবারে মতোই নানা মতের নানা পথের মানুষের সমাবেশ আমাদের পরিবারেও । আমাদের ঠাকুমার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল নেতৃত্বের । যাকে বলা হয় “ লিডারশিপ কোয়ালিটি ” । সাত-সাতজন বৌকে যৌথ পরিবারের বিভিন্ন কাজ বন্টন করে দেয়া অতি সুচারুভাবে ,যে কত বড় কঠিন কাজ তা কেবল কল্পনাই করা যায় ! বাস্তবে তা বাস্তবিক-ই এক কঠিনতম নেতৃত্ব । অথচ , বিনা বাক্যব্যয়ে , বিনা ঝামেলায় সে কাজ সুচারু ভাবে পালন করে গেছেন আমার পিতামহী যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন-ই । আমার মা যখন প্রায় আজীবন ঢাকাবাসী হয়েও পরিবারের বৌ হয়ে আসেন এক অজপাড়া গাঁয়ে, তাকেও সমান দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অন্য সব বৌদের মতোই । এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও শ্বাশুড়ি মাতার এই নিরপেক্ষতাকে পরবর্তীতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে দেখেছি আমার মাকে ।

আমার এখনো মনে আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই কঠিন সময়টাতে আর অনেক হিন্দু পরিবারে মতো আমাদের পরিবারও কি এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে কাটিয়েছে। একেতো বিরাট বিশাল যৌথ পরিবার, তার উপর বিভিন্ন স্থান থেকে পালিয়ে আসা আত্মীয়-স্বজন । কিন্তু এক মাত্র রক্ষা গ্রামের অবস্থানগত সুবিধা । বর্ষার সময় চারিদিকের বিল পেরিয়েই কেবল আমাদের গ্রামে প্রবেশ করতে হতো । আর আশ-পাশের গ্রামের মুসলিমদের ভেতরও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ছিলো । শুধু মাত্র ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাজপাঙ্গ ছাড়া রাজাকার তেমন একটা গজিয়ে উঠে নি অন্ততঃ যুদ্ধের শেষ কয়েক মাস পর্যন্ত । তাই মোটামুটি নিরাপদই ছিল আমাদের এলাকাটা ।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো বর্ষার সময় দিনে রাতে পাহারা বসিয়ে । তাছাড়া , বাবার কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র অস্ত্র জমা রাখতো নিয়মিত আমাদের বাড়িতে । আর আমার জ্যাঠাতো ভাই আর তার বন্ধুদের সে হাতে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক এলাহি কান্ডকারখানা আমরা ছোটরাও যেন একেক জন খুদে মুক্তিযোদ্ধা । মনে আছে স্বাধীনতার অনেক দিন পর্যন্ত মুক্তি-যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাই ছিল আমাদের প্রধান খেলা । কেমন করে জানি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতাদের কথা আমাদের ভেতর গেঁথেছিলো বেশ পোক্তভাবেই । তাই আমরা বন্ধুরা কেউ সাজতাম বংগবন্ধু , কেউ তাজ উদ্দিন , কেউ বা আবার বংগবীর কাদের সিদ্দিকী । কারণ, টাংগাইলের সীমান্তবর্তী ইওয়াতে কাদের সিদ্দিকীর বীরত্ব গাঁথা তখন আমাদের কাছে এক রূপকথার রাজ কুমারের কাহিনী । সেই রেশ অনেকদিন পর্যন্ত ছিল মনের ভেতর । তাছাড়া , বংগবন্ধুর নৃশংস হত্যা কাণ্ডের পর অন্য সবার মতো আমারও বালক মনে এই ধারণাটা জন্মেছিলো যে, এক মাত্র কাদের সিদ্দিকী-ই পারবে এই হত্যা কাণ্ডের বদলা নিতে । তাই হাজার হাজার তরুন-যুবকের মতো আমিও উপস্থিত ছিলাম বিমান বন্দরে কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন । কিন্তু পরবর্তীতে সেই বংগবীরকে যখন নিজের কর্মক্ষেত্রেই চাক্ষুষ করেছি টেন্ডার প্যাকেজ বগল দাবা করে দৌড়োদৌড়ি করতে , তখন স্বর্গ থেকে পতনের মতো অবস্থা হয়েছে আমার । তাই পূর্বেই বলেছি, বিখ্যাত মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করি আমি । এ যেনো ভুলে থাকা মানেই , ভাল থাকা ।

(চলবে)

॥ ডিসেম্বর ১৪ , ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ॥

sarkerbk@yahoo.com